সূচিপত্র

অপ্রচলিত মাতৃপূজন ১৩
অভয়া মা ২৮
কাল রূপা ৩৭
নবপত্রিকা ও লৌকিক চণ্ডী কথা ৪৮
সনকা সর্বমঙ্গলা ৫৬
বাণিজ্য-ব্রত ও সমাজচিত্র ৬৬
সন্তোষী মা - বাঙালির চাকরি যাত্রা ৮২
শুভ দুর্গা, রাল দুর্গা ৯১
অপরাজিতা মা ও ইতিহাস ৯৯
শংকরতারণী ব্রত - অলক্ষুনে নারীর কথা ১০৮
পশুত্বে চেতনা চিলনি-মা ১১৫
দেবতার লাম্পট্য ১২৪
লাল দুর্গা ১৩২
মলুটির মা ১৩৮
নারীর দশা - ইতুপূজা ১৪৯
চৌদ্দশাক-চৌদ্দদীপ কথা ১৫৯
অঘ্রাণের পালা - পার্বণ ও প্রকৃতি রক্ষা ১৬৬
অশ্বত্থ ব্রত ১৭৪
ছড়া বৃত্তি ১৮০

।। অপ্রচলিত মাতৃপূজন ।।

"বৈশাখের খরদুপুর। বাড়িতে খাবার তেমন কিছু নাই, ডান হস্তের শাঁখাখানাও বেড়েছে। অপেক্ষার প্রহর মা-কে ক্রোধান্বিত করে।

জ্ঞানবৃদ্ধ পতি তাঁর মানুষকে উদ্ধার অর্থাৎ শ্মশানস্বরূপ বৈরাগ্যের পথ দেখিয়ে বেড়ান। কিন্তু নিজে তো সংসারী, এমন উদাসীন হলে তো গৃহ চলে না।

মায়ের হাতে তালুতে গোটা বিশ্বসংসার। অঞ্চলপ্রান্তে কুঞ্চিকাগোছের মতো বদ্ধ আছে মানুষের সুখ, দুঃখ, ভাগ্য!

তাঁর ডান হস্তে সংসারের প্রসন্ন লক্ষ্মী, বাম হস্তে বৈরাগী, সন্ন্যাসীর ইষ্ট। সেই ডান হস্তের শাঁখা বেড়েছে, তিনি তো মা হয়ে উতলা হবেনই।

এদিকে মানুষটার হুঁশ নাই। ঘরে আর আসে না। শাঁখা নিয়ে ফেরার কথা। অবশেষে তিনি এলেন, বেলাদুপুর গড়িয়ে... মায়ের জগদ্দল ধৈর্যও তখন টুটে গেছে। তিনি শাঁখা চাইলেন আর উলটোদিকে পরমেশ্বর মস্ত জিভ কেটে বসলেন।

ব্যস! যা হওয়ার তা-ই হল। মা সব কিছু নিয়ে উঠলেন বাপের বাড়ি। আর তিনি ফিরবেনই না।

দিন যায় কাল যায়, মা আর ফেরেন না। এ-দিকে একলা পুরুষমানুষের সংসার যে চলে না। নন্দী, ভৃঙ্গি প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গরা বাড়া ভাত পায় না। তারাও "মা, মা" করে। বাবার মনটা হু-হু করে। অতএব বাবা ভোলানাথ মায়ের রাগ ভাঙাতে চললেন শাঁখারির বেশে।

শ্বশুরবাড়ির সন্নিকটস্থ গাছের তলায় এসে জামাই নিজের পসরা সাজিয়ে বসলেন। শ্বশুরবাড়ির কেউই জামাইকে চিনতে পারল না। কিন্তু মা ঠিকই চিনে নিলেন। মায়ের রাগ ভাঙল।

ভূ-লোকে তাঁদের সেই কালযাপন এক সন্তানের জন্ম দিল। সেই সন্তানকে পিতৃগৃহেই রেখে মা ফিরে গেলেন নিজ সংসারে। বিষয়টি বড়ো মর্মাহত করে ঠিকই, কিন্তু সে-সময় অভাবের সংসারে মাতুলালয় অনেকেই এমনভাবেই বড়ো হত। আর মায়ের তো বিশ্বসংসার। অভাব হবেই। যেন একখানা মস্ত ত্রিপল চাপা দিয়েছেন ধরাকে— এইদিক ধরে টানেন তো ওইদিক ফাঁকা হয়ে যায়। তা ছাড়া, জাগতিক জ্ঞানে তাঁর কর্মের দ্বারা আমাদের কর্মকে ঘষে দেওয়াও প্রয়োজন; নাহলে তো সবই অলৌকিক হত, তিনি নরেশ্বরী হবেন কী করে...

তা সেই কন্যা, মাতুলালয়ে নারীর পৃথিবীতেই বড়ো হতে লাগল। সেই মা-ই পরবর্তীকালে আমাদের মা দুর্গার মর্ত্যবাসিনী ক্ষুদ্র প্রতিরূপ মা বনদুর্গা।"

***

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালে শিলের টুকরোগুলো পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে সফেদ ফেনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ছাট এসে মায়ের রেড়ির বড়ো প্রদীপের শিখাটিকে তরাস ধরালে। ছেদ পড়ল কাহিনিতে।

বাবাঠাকুর উঠে গিয়ে চাঁচের দোরটা টেনে দিয়ে এলেন। গায়ের ভিজে কাপড়টা ছেড়ে এসে বসলেন।

সাদা দাড়ির ওপর চিকচিক করছে জলবিন্দু। প্রদীপের কাঁপা শিখা যেন অজস্র আলোকবিম্ব তৈয়ার করে উদ্ভাসিত করে তুলেছে বৃদ্ধের মুখ। বৃদ্ধ শুরু করলেন আবার, "মায়ের

সন্তান হয়ে মর্ত্যে থাকলেন আর এক মা। গভীরে ভাবলে, মায়েরই সন্তানই মা। কারণ মা থেকেই মা আসেন। মা একটি জীয়ন্ত, শাশ্বত কিংবদন্তি, যাঁর আধার স্নেহ ও শক্তি।

আমাদের তত্ত্ব ও আলোচনার প্রসঙ্গে, আমরা যেগুলিকে মিথ বা কিংবদন্তি ভাবি, সেগুলি আদতে গভীর ব্যঞ্জনাময় দ্যোতক।

আমরা কলেজে পড়া কালে রাডইয়ার্ড কিপলিং নামে ব্রিটিশ নাট্যকারের উক্তি পড়েছিলাম, 'ভগবান সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাই তিনি মা-কে তৈরি করেন।' আমাদের এই মা বনদুর্গার উৎপত্তি ও তত্ত্বকথা অনেকটা ওরকমই। মা নিজে উপস্থিত হতে পারলেন না, তাই তার কন্যাকে আমাদের মাঝে রক্ষায়ত্রী 'মা' করে রেখে গেলেন।"

***

এইবেলা আমাদের বৃদ্ধ বাবাঠাকুরের পরিচয়টি দিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের দাদা-জ্যাঠাদের কাছে শুনেছি, বাবাঠাকুর আমাদের গ্রামের সর্বপ্রথম আই.এ. পাশ দেওয়া ব্যক্তি। সে-সময় কলকাতার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিও পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তিনি তখন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

বাবাঠাকুর জমিদারগৃহের সন্তান। আভিজাত্য ছিল। সেইসঙ্গে কৈশোর থেকে ছিল বক্তৃতা রাখার সহজাত দক্ষতা। অনুশীলন সমিতি তাঁর এই গুণকে কদর করেছিল। অবিভক্ত বাংলার পথে-প্রান্তরে অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ গোঠ বিশ্বাস। সাজা, কালাপানি হয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন ষাটের দশকের শেষে। আমরা তখন কলেজে পড়ি। তবে মানুষটা আর তখন ভূপেন বিশ্বাস নন, পুরোদস্তুর এক সাধক।

সম্পত্তি দূর অস্ত, পূর্বাশ্রমে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের কাছেও থাকেননি। মাঠ-পুকুরে সর্প-উপদ্রুত থানে নিজের চালামন্দির গড়ে রয়ে গিয়েছিলেন। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে মহাসমারোহে মায়ের আরতি করতেন প্রতি শনিবার। আমরা শনি-সন্ধ্যায় তাঁর সন্ধ্যারতি দেখতে যেতুম। তিনি প্রসাদী গুড়, বাতাসা আর পাঠ দিতেন, অর্থাৎ আমাদের চক্ষু খুলতেন। আজও তেমনই এক দিন, অপ্রচলিত মাতৃপূজার পাঠ।

***

বাবাঠাকুর বলে চললেন, "দেখো, মা-কে আমাদের মননের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে তো হবে না। তাঁর পূজা-পাঠ, রীতিনীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। আসো, মা বনদুর্গার পূজারীতি সম্বন্ধে আমি তোমাদের খানিকটা ধারণা দিই।

মায়ের পূজার আদি কথা যেটা ধরা হয়— একসময় আদিদেব পঞ্চমুখে দুর্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন এবং তাঁর সম্মুখে বসে গণেশঠাকুর তাঁর চারিহস্তে সেই মাতৃস্তুতি লিপিবদ্ধ করছেন। এখন পঞ্চমুখে পাঁচটি মাহাত্ম্যকথা আর তাঁর চারটি হস্ত; স্বাভাবিকভাবেই একটি বর্ণনা বাদ চলে যায়।

বিষয়টি গোচরে এলে মা বলেন, সমস্যা নেই। মর্ত্যে মা হয়ে অবস্থান করছেন তাঁরই কন্যা। তিনিই মর্ত্যের দুর্গা। তিনিই মাতৃকা-মাহাত্ম্য আপনার কর্মের মধ্যে দিয়ে সমাপন করবেন এবং মাতৃকা-মাহাত্ম্য চরাচরে ছড়িয়ে দেবেন। সেই হতেই মর্তের অরণ্য হতে সমাজ কিংবা গৃহ— সর্বত্র মা দুর্গা লৌকিক দুর্গা বা বনদুর্গা রূপে অধিষ্ঠান করছেন।"